আজকের কাগজ

তারিখ 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বর্ণমালা বানান ও লিপি ঃ সংস্কারের প্রশ্ন

আবুল কাসেম ফজলুল হক

বাঙলা ভাষার কি একটি বিশুদ্ধ রূপ আছে? যদি থাকে তাহলে সেটি কি? যদি না থাকে তাহলে বাঙলা ভুল লেখা হচ্ছে বলে হৈ চৈ করা হয় কেন?

ছাত্রদের পরীক্ষার খাতা দেখতে গেলে মুহম্মদ শহীদুল্লাহ যেখানে কোনো ভুল ধরতেন না, মুহম্মদ এনামুল হক সেখানেও ভুল খুঁজে পেতেন। রাস্তায় চলতে গিয়ে কোনো কোনো সাইন বোর্ড দেখে এনামুল হক উত্তেজিত হয়ে উঠতেন, কিন্তু শহীদুল্লাহ মুচকি হেসে কথা শেষ করতেন। কাজী মোতাহার হোসেন, মুহম্মদ আবদুল হাই, আবুল ফজল, কবি আবদুল কাদির-এঁরা শুদ্ধাশুদ্ধির ব্যাপারে সতর্ক ছিলেন, কিন্তু এনামুল হকের কঠোরতার অনুসারী ছিলেন না। মুহম্মদ আবদুল হাই, আহমদ শরীফ, কিংবা আনিসুজ্জামান বাঙলা ভাষার যেসব বিধি-বিধানের প্রশ্নে কঠোর, সেগুলোর কোনো-কোনোটিকে মেনে চলবার কোনো প্রয়োজনই অনুভব করতেন না মুনীর চৌধুরী ও মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী। কোনো কোনো বিতর্কিত প্রশ্নে আবু হেনা মোস্তফা কামাল ও আনিসুজ্জামানের সিদ্ধান্ত সহজেই লঙ্ঘন করেন হুমায়ুন আজাদ, রফিক আজাদ, আবদুল মান্নান সৈয়দ ও আরও কেউ কেউ। ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধির প্রশ্নে সৈয়দ আলী আহসান, দেওয়ান মোহাম্মদ আজরফ, কাজী দীন মুহম্মদ, মোহাম্মদ মাহফুজউল্লাহ, কবি আল মাহমুদ-এঁরা কি একই ধরনের মত পোষণ করেন? তিতাস চৌধুরী, ময়ুখ চৌধুরী, আবুল আহসান চৌধুরী, শান্তনু কায়সার, যতীন সরকার, মাহবুবল হক-ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে এঁদের সচেতনতা কি এক পর্যায়ের? বদরুদ্দীন উমর, শামসুর রাহমান, সৈয়দ শামসুল হক, শওকত আলী, হাসান আজিজুল হক, বশীর আলহেলাল, নরেন বিশ্বাস, আখতারুজ্জামান ইলিয়াস, সেলিনা হোসেন, এঁদের বানানরীতি কি এক? হুমায়ুন আহমেদ, ইমদাদুল হক মিলন ও অন্যান্য জনপ্রিয় লেখকেরা ভাষার গতিধারায় কি প্রভাব ফেলছেন? সাংবাদিকদের মধ্যে অনিরুদ্ধ, গাছপাথর, ভাষ্যকার, সন্ধানী, সুহৃদ, অনিকেত-ভাষার প্রশ্নে এঁদের মধ্যে কি ভিন্ন ভিন্ন ধরনের সচেতনতা লক্ষ্য করা যায়? পন্ডিত, কবি, কথাসাহিত্যিক, সাংবাদিক, জনপ্রিয় লেখক -এঁদের ছেড়ে আমরা যদি প্রতিষ্ঠানের দিকে তাকাই, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বাঙলা একাডেমি, টেক্সট বুক বোর্ড-ইত্যাদি প্রতিষ্ঠানের পুস্তকাদি লক্ষ্য করি, তাহলে সেগুলোতে বানানের কি ধরনের রূপবৈচিত্র আমাদের দৃষ্টিগোচর হয়? ভাষার প্রশ্নে অর্ধশিক্ষিত ও অশিক্ষিত লোকদের মধ্যেও কি ঐক্য দেখা যায়?

বাঙলা ভাষার একটি বিশুদ্ধ রূপ আছে এ বিশ্বাস কি ঠিক? যদি ঠিক হয়, তাহলে এত কেন? মনসুর মুসা যদিও ভাষার প্রশ্নে তাঁর মতামতকে আমি অত্যন্ত সংরক্ষণবাদী বলে মনে করি, বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ্য করি, এক প্রবন্ধে প্রশ্ন উত্থাপন করেছেন।

"বিশুদ্ধ ভাষা কোথা হতে আসে? এ প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব কি হতে পারে? বার- তের কোটি লোক বাঙলা ভাষায় কথা বলেন। কোটি কোটি লোক ইংরেজী, আরবী, চীনা, রুশ ইত্যাদি ভাষা বলে থাকেন। তার মধ্যে কে বা কারা, কতজন লোক বিশুদ্ধ ভাষায় কথা বলেন? তের কোটি বাঙলা ভাষাভাষীর মধ্যে কোন তের জন লোক প্রকৃতপক্ষে বিশুদ্ধ ভাষার ধারক বলে গণ্য হতে পারেন? যাঁরা বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন বলে দাবী করা হয়, সে বিশুদ্ধ রূপটি তাঁরা কেমন করে আয়ত্ত করলেন? যদি ধরে নেওয়া যায়, তের কোটি লোকের মধ্যে তের জন লোক বিশুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন, তার অর্থ কি এই নয় যে, বাকী সকলেই অশুদ্ধ ব্যবহার করছেন? অশুদ্ধ ব্যবহারকারীরা অশুদ্ধই যদি বলেন বা লেখেন তবে তারা পরস্পরকে ভুল বোঝেন না কেন? অশুদ্ধ বলার ফলে যে সামাজিক নৈরাজ্যের সৃষ্টি হওয়া প্রয়োজন ছিল তা তো হয় না। যাঁরা শুদ্ধ ভাষা ব্যবহার করেন না, তাঁরা কি একই নিয়মে অশুদ্ধ ব্যবহার করে থাকেন? অশুদ্ধ ভাষার কি কোন নিয়ম আছে?"

বাঙলাভাষীদের মধ্যে বাঙলা ভাষার শুদ্ধশুদ্ধি নিয়ে মাঝে মাঝেই যে মৌখিক বিতর্কের ঝড় ওঠে তাতে মনে হয়, উত্থাপিত এই প্রশ্নগুলোর লিখিত জবাব দরকার। বিতর্কের ঝড় যেটুকু সময় ও শক্তি হরণ করে নেয়, তাতে যে অপচয় ঘটে সেই অপচয় বন্ধ করার জন্যই প্রশ্নগুলোর জবাব দরকার। মনসুর মুসার প্রবন্ধটি আমার সম্পাদিত 'স্বদেশচিন্তা' গ্রন্থে সঙ্কলিত আছে, উৎসাহী পাঠক পড়ে দেখতে পারেন। উক্ত প্রবন্ধে বলা হয়েছেঃ

"ভাষার এই বিশুদ্ধি-চেতনা কোনো কোনো ক্ষেত্রে চরম সঙ্কটের জন্ম দেয়। পৃথিবীর কতকগুলো ভাষায় এই বিশুদ্ধি- চেতনা বেশ প্রকট। তার মধ্যে গ্রীক, জার্মান, আরবী ও ফারসী, ফরাসী ও নরওয়েজিয়ান, সিংহলী ও বাঙলা প্রধান।"

বাংলা ভাষার নাম এখানে সব শেষে উল্লেখ করা হলেও বাঙলা ভাষীদের মধ্যেই বোধ হয় এ ব্যাপারে সচেতনতা, স্পর্শকাতরতা ও শুচিবাইগ্রস্ততা সবচেয়ে বেশি।

> বাঙলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় কেউ কেউ লিখছেন। বাংলাদেশ ভাষা সমিতি কয়েকবার এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে বইও প্রকাশ করেছেন। বাঙলা একাডেমির টেক্সট বুক বোর্ডের ও বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের নতুন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম নিষ্পত্তিতে পৌছা যাবে বলে মনে হয় না।

আজকাল আমাদের দেশে রাজনীতি যেমন বহুলাংশে মৌখিক হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি ভাষা বিষয়ক তর্ক-বিতর্কও মৌখিক ও বক্তৃতা-নির্ভর হয়ে দাঁড়িয়েছে। গত দুই- তিন বছরের মধ্যে অবশ্য লেখার প্রবণতা কিছুটা দানা বাঁধছে। কিন্তু অতীতে অবস্থা এমন ছিল না। ১৯৫০-এর এবং ৬০-এর দশকেও এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ লিখিত আলোচনা-সমালোচনা ও তর্ক-বিতর্ক হয়েছে। সাধারণ শিক্ষিত লোকদের থেকে দেশের শীর্ষ-স্থানীয় পন্ডিতেরা পর্যন্ত বিতর্কে অংশ নিয়েছেন। যদি কেউ বলেন যে, সেসব বিতর্কের সবগুলোই রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে প্ররোচনামূলক ছিল কিংবা পাতানো খেলা ছিল, তাহলে হয়তো তিনি মোটেই সত্য কথা বলবেন না।

যতদূর মনে পড়ে, বাঙলা বানান-সংস্কারের উদ্দেশ্যে ১৯৬০-এর দশকে বাঙলা একাডেমি কর্তৃক গঠিত বিশেষজ্ঞ পরিষদে সদস্য ছিলেন নয় জন। মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, কাজী মোতাহার হোসেন, আবুল হাসনাত, মুহম্মদ আবদুল হাই, মুহম্মদ ওসমান গনি, মুহম্মদ ফেরদৌস খান, মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী এই সাত জন। সেদিন তাঁরা বাঙলা বর্ণমালা সংস্কারের জন্য যে সুপারিশ প্রণয়ন করেছিলেন, এবং প্রকাশ ও প্রচার করেছিলেন তা কি তাঁরা চাপের মুখে ভয়ে ভয়ে করেছিলেন, না কি প্ররোচনার মুখে প্রলোভনে পড়ে করেছিলেন? আমাদের জাতীয় ইতিহাসের এ এক গুরুতর প্রশ্ন বলে আমার মনে হয়; কারণ দেখতে পাইব ভাষা-বিষয়ক একই ধরনের প্রশ্ন ক্রমাগত ওঠে, একইভাবে সমস্যা আলোচিত হয়, আবার ভাষার রূপও একই রকম সমস্যাপূর্ণই থেকে যায়।

যে- প্রশ্নটিকে আমাদের জাতীয় ইতিহাসের একটি গুরুতর প্রশ্ন বলে আমি উল্লেখ করলাম সেটি সম্পর্কে আমার জ্ঞান অতি অল্প। কিন্তু প্রশ্নটি আমার মনে জেগেছে সেই দিন, যেদিন পঁচিশ বছর আগে, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের বাঙলা বানান সংস্কারের উদ্যোগের যথাসম্ভব বিরোধিতা করেছিলেন মুহম্মদ এনামুল হক, মুহম্মদ আবদুল হাই এবং মুনীর চৌধুরী। আমার যতদূর মনে পড়ে, এই বিরোধে উদ্যোগী ছিলেন মুনীর চৌধুরী; মুহম্মদ এনামুল হক ও মুহম্মদ আবদুল হাইকে তিনিই সক্রিয় করেছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগ ছিল বাঙলা একাডেমির পূর্বোক্ত সুপারিশেরই সমর্থনে। বাঙলা একাডেমির সর্বসম্মত সুপারিশ যাঁরা প্রণয়ন করেছিলেন, তাদেরই দু'জন সেই সুপারিশের প্রতি সমর্থনদানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে বিরত করতে চাইলেন সঙ্ঘবদ্ধ প্রচেষ্টার মাধ্যমে। বাংলা ভাষা-সংস্কারের প্রশ্নে

আজকের কাগজ

তারিখ 23 NOV 1992
পৃষ্ঠা ৪ কলাম ৩

বাংলা একাডেমির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সেদিনের প্রয়াস ব্যর্থ হয়ে যায় বটে, কিন্তু তার প্রভাব সম্পূর্ণ মুছে যায়নি। বাঙলা একাডেমি এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেদিন বাংলাকে ইংরেজির স্থলাভিষিক্ত করতে গিয়ে বাংলা ভাষার সংস্কারের প্রয়োজন অনুভব করেছিলেন- বাংলা ভাষার ব্যবহার- উপযোগিতা বাড়াতে ও সহজ করতে চেয়েছিলেন। বাঙলা একাডেমির এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙলা বর্ণমালা ও বানান সংস্কার বিষয়ক সেদিনের প্রস্তাব প্রকাশিত ও প্রচারিত হয়েছিল। ফলে ভাষা-ব্যবহারকারী শিক্ষিত লোকদের মনে তার প্রভাব পড়ে। সেই প্রভাবের পরিচয় বাঙলাদেশের মুদ্রিত বাঙলা লেখায় অনুসন্ধান করলে পাওয়া যাবে। আজ যাঁরা একান্ত রক্ষণশীল মন নিয়ে পুরাতন অভিধান ও পুরাতন অনুশাসনমূলক ব্যাকরণে ফিরে গিয়ে বাঙলা ভাষার শুদ্ধতা বিধান করতে চাইবেন, তাঁদের অভিপ্রায় কি সফল হবে? সফল হওয়া কি উচিত?

বাঙলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি নিয়ে পুনরায় আলোচনা শুরু হয়েছে। পত্র-পত্রিকায় কেউ কেউ লিখছেন। বাংলাদেশ ভাষা সমিতি কয়েকবার এ নিয়ে আলোচনার আয়োজন করেছে। ইতিমধ্যে কেউ কেউ এ বিষয়ে বইও প্রকাশ করেছেন। বাঙলা একাডেমির টেক্সট বুক বোর্ডের ও বাংলাদেশ প্রেস ইন্সটিটিউটের নতুন সচেতনতার পরিচয় পাওয়া যাচ্ছে। অল্প সময়ের মধ্যে কোনো রকম নিষ্পত্তিতে পৌছা যাবে বলে মনে হয় না। তবে আন্তরিক আলোচনা চলতে থাকলে অনেক বিষয় স্পর্শ হবে এবং তখন সমাধানে পৌছা সম্ভবপর হবে।

বাঙলা ভাষার শুদ্ধাশুদ্ধি সম্পর্কে যে প্রশ্নটি প্রথমেই ওঠে তা হল বাংলা বানানের সমস্যা। এখানে আমি এই সমস্যার প্রকৃতি কিংবা বিতর্কের স্বরূপ বিশ্লেষণ করতে যাব না। আমার ধারণা, সঠিক এ-সমস্যার প্রকৃতি সম্পর্কে অবহিত আছেন। বানানের প্রশ্নে সৃষ্ট বিতর্ক থেকে বর্ণমালা সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। তাতে এক দল দাঁড়াল সংরক্ষণবাদী; তাঁরা বর্ণমালার যে কোনো রকম পরিবর্তনের ঘোর বিরোধী। সংস্কৃতের প্রতি তাদের বিশেষ আকর্ষণ; ব্যাকরণের প্রশ্নে তাঁরা ভীষণ সংস্কৃত- ঘেঁষা। তাঁদের সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান- যে খুব গভীর, সে প্রমাণ অবশ্য তাঁরা দেননি। আর এক দল দেখা যায় পরিবর্তনের সমর্থক- আন্তরিকতার, স্বতঃস্ফূর্ততার ও সরলীকরণের প্রতি তাঁদের বিশেষ সমর্থন; কিন্তু যুক্তি-বুদ্ধি, বিচার-বিবেচনা, শৃঙ্খলা ও শিক্ষার প্রতি তাঁদের মনোযোগ কম। তাদেরকে বলা যায় স্বতঃ স্ফূর্ততাবাদী। তৃতীয় আর এক পক্ষ আছেন যে পক্ষের সংখ্যার শক্তি খুবই কম। এই তৃতীয় পক্ষ পরিবর্তনকে স্বীকৃতি দেওয়ার পক্ষে, সংস্কারের সমর্থক, কিন্তু স্বতঃস্ফূর্ততার ও যথেচ্ছারের বিরোধী। এঁরা ভাষার গতি প্রকৃতি অধ্যয়ন করে কালোপযোগী উন্নততর নতুন অনুশাসনমূলক ব্যাকরণ প্রণয়নের পক্ষপাতী। বানান থেকে বিতর্ক বর্ণমালা-সংস্কারে প্রসারিত হয়, তারপর বর্ণমালা সংস্কার থেকে লিপি সংস্কারের প্রশ্ন ওঠে। সংরক্ষণবাদীরা যেমন আছে, যে- কোনো মূল্যে ঠিক তেমনি রাখতে তৎপর। স্বতঃস্ফূর্ততাবাদীরা যুক্তবর্ণ বিশ্লিষ্ট করা থেকে আরম্ভ করে এক সঙ্গে অনেক পরিবর্তনের প্রস্তাব করেন। আর যুক্তিবাদীরা অল্প পরিবর্তনের বা সামান্য সংস্কারের পক্ষে মত প্রকাশ করেন।

বাঙলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী দুই দশকে এ-বিষয়ে অল্পই আলোচনা হয়েছে। কোনো পক্ষের বক্তব্যই কোনো পক্ষ গ্রহণ করতে চান না এবং বিষয়টিকে মুক্ত আলোচনায় আনতেও কেউ কার্যকরভাবে উৎসাহী হন না। বাঙলা একাডেমির কিংবা টেক্সট বুক বোর্ডের রুদ্ধদ্বার ওয়ার্কশপের মাধ্যমে সিদ্ধান্তে পৌঁছার চেয়ে মুক্ত আলোচনা এ-ব্যাপারে মঙ্গলকর হবে বলে আমার ধারণা। মুক্ত আলোচনা চলার পর এক পর্যায়ে গিয়ে বিশেষজ্ঞরা প্রকৃত অবস্থা বিচার করে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

কিন্তু এ ব্যাপারে মুক্ত আলোচনায় কিছু গুরুতর বাস্তব সমস্যা আছে। প্রথম সমস্যাই হল কার্যকর আলোচনা চালাবার মতো সাময়িকপত্রের অভাব। পাঠক এ সম্পর্কে অবহিত আছেন বলে ধারণা করি। জনপ্রিয় আবেগ, প্রচলিত বিশ্বাস ও গতানুগতিক প্রচার ধারাও বিরাট অন্তরায়। আমাদের দেশে ভাষা বিষয়ে, আবেগ যতটা প্রবল, সুচিন্তিত কার্যক্রমের দিকে মনোযোগ সেই তুলনায় কম। পাকিস্তান আমলের অভিজ্ঞতাই আজও এদেশের ক্ষমতাবান পন্ডিতদের মনকে ভয়ানকভাবে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। 'দুঃখিনী বর্ণমালা' -র পুরাতন মানসিকতা কিংবা 'একটি বাঙলা অক্ষর একটি বাঙালির জীবন' -জাতীয় পুরাতন উত্তেজনা, মনে হয়, আজও এদেশের শুধু সাধারণ মানুষদের নয়, ক্ষমতাবান পন্ডিতদের ও জনপ্রিয় নেতাদের মনকেও সম্পূর্ণ আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এ-অবস্থায় এ বিষয়ে সংস্কারমুক্ত দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে আলোচনা-সমালোচনায় অগ্রসর হওয়ার পথে অন্তরায় অনেক। তবে বেশ কিছু লোক যদি এ-ব্যাপারে মুক্ত আলোচনায় উৎসাহী ও উদ্যোগী হয়ে ওঠেন এবং দু-একটি পত্রিকা যদি এ ব্যাপারে কার্যকরভাবে আলোচনা সমালোচনা প্রকাশ করতে সম্মত হয়, তাহলে বাঙলা ভাষার অর্থাৎ বাঙলাভাষী জনগোষ্ঠীর জন্য তা খুবই কল্যাণকর হবে।

আমার মনে হয়, বাঙলা ভাষার উপাদানসমূহের মধ্যে এমন কিছু বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে, সেগুলোর ফলে বিগত প্রায় দেড়শ বছর ধরে সব সময়েই এ ভাষায় শুদ্ধাশুদ্ধির প্রশ্নে, বিশেষ করে বানান, বর্ণমালা, ও লিপি সংস্কার প্রশ্নে ক্রমাগত আলোচনা-সমালোচনা হচ্ছে, সময় ও মেধা ব্যয় হয়ে যাচ্ছে। ১৯৩৬ সনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বাঙলা বানানের যে নিয়ম প্রবর্তন করতে চেয়েছিল, তার পূর্ববর্তী পঞ্চাশ বছর কালের বাঙলা পত্র-পত্রিকা খুললেই এ বিষয়ে বিস্তর আলোচনার ও বাদ-প্রতিবাদের সন্ধান পাওয়া যায়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানের নিয়ম প্রকাশিত হওয়ার পরেও বিতর্ক থেমে থাকেনি। আর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিয়ম মোটামুটি সর্বস্বীকৃত হলেও আজ পর্যন্ত অতি অল্পসংখ্যক লোকই সচেতনভাবে যে নিয়ম অবলম্বন করেন।

বাঙলা ভাষায় ১০০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক, কোনো লেখকের বিশুদ্ধির মান অনুযায়ী, ছাপতে হলে যে শ্রমশক্তি লাগে, এই বাংলাদেশেই ইংরেজি ভাষায় ১০০ পৃষ্ঠার একটি পুস্তক, কোনো লেখকের বিশুদ্ধির মান অনুযায়ী, ছাপতে হলে হয়তো তার অর্ধেক শ্রমশক্তি লাগে। ১০০ পৃষ্ঠার বাংলা লেখা কি ১০০ পৃষ্ঠা ইংরেজি লেখা থেকে বেশি বক্তব্য ধারণ করতে পারে? বর্তমানে মুদ্রনে কম্পিউটার ব্যবহারের কালে বর্ণমালা সংস্কারের প্রশ্ন নতুনভাবে উঠেছে। কেউ কেউ বলছেন, কম্পিউটারে বর্ণের ও স্বরচিহ্নের আধিক্যের সমস্যা কোনো সমস্যাই নয়; সংখ্যা আরও কয়েকগুণ বড় হলেও কম্পিউটারে কোনা অসুবিধা হবে না; কম্পিউটারের কেপাসিটি অন্তহীন। তাঁরা ভেবে দেখেন না যে কম্পিউটার ব্যবহারে মানুষ দরকার হয়; সেই মানুষের কেপাসিটি সীমাবদ্ধ। মেধার ও শ্রমশক্তির অপচয় কম্পিউটারেও ঘটে। কম্পিউটারের যুগেও বিভিন্ন ভাষার লোকদের মধ্যে পারস্পরিক প্রতিযোগিতা বিলুপ্ত হয় না। মুদ্রাকরের সমস্যা এক রকম, লেখকের সমস্যা আর এক রকম, শিক্ষার্থীর সমস্যা আরও ভিন্ন প্রকৃতির।

আগামীকাল সমাপ্য

আবুল কাসেম ফজলুল হকঃ প্রধান সম্পাদক 'লোকায়ত'। 'কালের যাত্রার ধ্বনি' 'মানুষ ও তার পরিবেশ' 'যুগসংক্রান্তি ও নীতি জিজ্ঞাসা'-প্রভৃতি গ্রন্থের লেখক। অধ্যাপক বাঙলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।